IBJCAL
International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics
ইন্টারন্যাশনাল বাইলিঙ্গুয়াল জার্নাল অফ কালচার, অ্যানথ্রোপলজি অ্যাণ্ড লিঙ্গুইস্টিক্স্
eISSN: 2582-4716

বীরভূম জেলার ঢেকারো জনগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতি

শান্তনু মণ্ডল
সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ইমেল- santanumondalju@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Received 25/04/2019
Received (revised form) NA
Accepted

Keywords:
বীরভূম জেলার ঢেকারো জনগোষ্ঠী,
ঢেকারো জনগোষ্ঠীর জীবন,
ঢেকারো জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি,
ঢেকারো সংস্কৃতি,
বীরভূম জেলার সংস্কৃতি,
বীরভূম জেলার জনগোষ্ঠী।

ABSTRACT

ঢেকারো জাতি অস্ট্রিক জাতিগোষ্ঠীর একটি শাখা। গ্রিয়ারসন সাহেব এর মতে খেড়িয়া-ভূমিজদের ভাষা মুণ্ডা ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যেই পড়ে। যদিও এখন তাদের সেই অকৃত্রিম ভাষা নেই, এখন তারা হিন্দি- বাংলা মিশ্রিত খোট্টা ভাষায় কথা বলে। ঢেকারো জনজাতি পুরুষানুক্রমে দাবি করে আসছে যে, তারা বীরভূমের রাজনগররে বীররাজাদের সময়কালে ছোটনাগপুর থেকে বীরভূমে আসে। ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল পরগণার অরণ্যঘেরা পাহাড় অঞ্চলে ঢেকারো জনজাতিটির বর্তমান অবস্থান। পারিপার্শ্বিক সহজলভ্য বিচপাথর গলিয়ে লোহা নিষ্কাশন করা এবং কামারশালা বৃত্তি করা বিশেষ করে হাতুরি, গাঁইতি, শাবলের পাশাপাশি দু-মুখো ধারালো দা, দু-মুখো বল্লম, দু-মুখো তরোয়াল তৈরীতে বেশ প্রসিদ্ধ। এছাড়া এদের সবচেয়ে বড় কীর্তি হল গাদাবন্দুক নির্মান কৌশল সাঁওতাল বিদ্রোহে সাঁওতালদের ইংরেজদের লড়াইতে অতিমাত্রায় সাহায্য করেছিল। সুতরাং এই জনজাতিটির জাতিত্বের বিবরণে একটি উল্লেখযোগ্য ইতিহাস আছে। অথচ আজ সাঁওতাল বিদ্রোহের এত বছর পরেও এদের কীর্তি কোথাও লিখিত হয় নি। বিদ্রোহ দমনের পর ইংরেজ সরকার এদের বিতাড়ন আরম্ভ করে, জাতব্যবসা নিষিদ্ধ করে, ক্রিমিন্যাল বলে ঘোষণা করে। এরপর থেকে অসামাজিক কিছু ঘটলেই এদের জেলে পাঠানো হতো। এতকিছুর মধ্যেও এদের সাংস্কৃতিক দিকটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে এদের জীবিকার কোনো ব্যবস্থা নেই। এরা সামাজিকভাবে শোষিত-বঞ্চিত হয়েও এদের চিরাচরিত সংস্কৃতিকে আজও বয়ে নিয়ে চলেছে। এদের মধ্যে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের বিভিন্নপ্রকার রীতিনীতি ও অনুষ্ঠান বাঙালি সংস্কৃতির সাথে খানিকটা জড়িয়েও যে অনেকটাই স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

১.০ সূচনা (Introduction)

ঢেকারো জনজাতিটির প্রকৃত বাস ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল পরগণার অরণ্যঘেরা পাহাড় অঞ্চলে। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন সীমান্ত অঞ্চলে একই ভুপ্রকৃতির বাতাবরণেও এদের অবস্থান। বীরভূম জেলায় এই জাতির জাতব্যবসা ছিল পারিপার্শ্বিক সহজলভ্য বিচপাথর গলিয়ে লোহা নিষ্কাশন করা এবং কামারশালা বৃত্তি করে বিভিন্ন ধরনের লোহার যন্ত্রপাতি বানানো। এখনো বীরভূমের ঢেকারো গ্রাম গুলিতে লোহা নিষ্কাশনের পর পরিত্যক্ত টুকরো পাথর দেখতে পাওয়া যায়। এদের হাতের তৈরী হাতুরি, গাঁইতি, শাবলের পাশাপাশি দু-মুখো ধারালো দা, দু-মুখো বল্লম, দু-মুখো তরোয়াল জনশ্রুতিতে বেশ প্রসিদ্ধ, এখনো তার নমুনা দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া ঢেকারো কামারদের সবচেয়ে বড় কীর্তি হল গাদাবন্দুক নির্মান, যেটি সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় সাঁওতালদের ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করতে অতিমাত্রায় সাহায্য করেছিল[১]। সুতরাং এই ঢেকারো জনজাতিটির জাতিত্বের

বিবরণে একটি উল্লেখযোগ্য ইতিহাস আছে। অথচ আজ সাঁওতাল বিদ্রোহের এত বছর পরেও এদের কীর্তি কোথাও লিখিত হয় নি। বিদ্রোহ দমনের পর ইংরেজ সরকার এদের বিতাড়ন আরম্ভ করে, জাতব্যবসা নিষিদ্ধ করে, ক্রিমিন্যাল বলে ঘোষণা করে। এরপর থেকে অসামাজিক কিছু ঘটলেই এদের জেলে পাঠানো হতো। এদের জীবিকার কোনো ব্যবস্থা নেই।

"ঢেকারো" এই শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে বা এই জাতির সঙ্গে এই নামের সম্পর্ক কি, তার সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। জনশ্রুতি আছে যে (ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত) ঢেকারো নামকরণ বা উপাধি ইংরেজ সরকার থেকে প্রাপ্ত। এই জনজাতির লোকেরা নামটিকে অবজ্ঞাসূচক মনে করে; অন্তত ঢেকারো নামটির সঙ্গে তাদের জাতির অধঃপতনের ভাব তাদের মনে আসে। স্থানীয় লোকজনেরা উচ্চারণ করে থাকে "ঢিকার"। তাদের মতে দিনরাত ঢক্ ঢক্ করে মদ্যপান করে বলে "ঢিকার" নামে পরিচিত। ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজে কালে এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে। ঢেকারোদের পচুই- আসক্তি দেখে বিস্মিত হতে হয়। সুতরাং শব্দতত্ত্বের গভীরে আলোচনা না করেও এটা বলা যেতে পারে যে ঢক্ ঢক্ করে মদ্যপান করার সঙ্গে ঢেকারো শব্দটির সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ট। আবার ব্রিটিশ কর্তিক ঢেকারোদের জাতব্যবসা নিষিদ্ধ হবার ফলে সেদিন চুরি- ডাকাতির পেশায় ঢেলারো সমাজের ঢি-ঢিক্কার পড়ে গিয়েছিল। স্থানীয় মানুষজনের মুখে মুখে প্রচারিত দেশময় ন্যক্কারজনক এই ঢি- ঢিক্কার থেকে এই নাম প্রচলিত হয়েছে মনে করা যেতে পারে। আবার এটাও মনে করা হয় যে "ঢেক" শব্দটি লৌহ সম্বন্ধযুক্ত শব্দ। আর এই জাতির জাত ব্যবসা ছিল লৌহ নিষ্কাশন ও লৌহজাত দ্রব্য উৎপাদন, ফলে সেখান থেকেই ঢেকারো নামটি এসেছে।

ব্রিটিশ সরকার এই জাতিটিকে সি. টি. এ -র (Criminal Tribes Act) অন্তভুক্ত করে। এই আইনের বলে ঢেকারো সমাজ চুরি করলেও অপরাধী, চুরি না করলেও অপরাধী সাব্যস্ত হত। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৯ নং ও ১১০ নং বিচার ধারায় ঢেকারোদের যখন তখন জেলে পুরা হত। এই দুই ধারাকে বলা হত বি. এল. কেশ। ১০৯ নং ধারায় ঢেকারোদের গৃহহীন করা হত এবং ১১০ নং ধারায় ঢেকারোদের কোনো স্থায়ী জীবিকার উপায় ছিল না। এই নির্যাতন থেকে ঢেকারো মেয়েরাও বাদ পড়েনি; বারো বছর হলে ছেলে মেয়ে সকলকে দাগি সাব্যস্ত করত ব্রিটিশ সরকার। স্বাধীন ভারতে অবশ্য তাদের আর সেই দশা নেই। ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে মহাশ্বেতা দেবীর নেতৃত্বে ঢেকারো কল্যান সমিতি গঠিত হবার পর থেকে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দু-দুবার জাতিটিকে জনজাতি রূপে (Schedule Tribe) ঘোষনা করার জন্য আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু তা আজও পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে "Schedule Tribe Order" পেশ হবার পর ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসের কমিশনের সুপারিশে "The Schedule Casts And Schedule Tribes Order " অ্যাক্ট প্রবর্তিত হলে যে রীতিতে খেড়িয়া, শবর, ভূমিজ, হো, মাহালী, কোড়া জাতিগুলিকে আদিবাসী তালিকাভূক্ত করা হয়েছে- অন্তত সেই রীতিতেই ঢেকারো জনগোষ্ঠীও আদিবাসী তালিকাভুক্ত হবার যোগ্য। এছাড়া আরও বলা যেতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম ও ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী এই ঢেকারোরা কোল, ভিল, বিরহড়, সাঁওতাল মুণ্ডা, লোধা এবং টেটোদের মতো আদিম আদিবাসী (Primitive Tribes) গোষ্ঠীরই মানুষ।

ঢেকারো জাতি অস্ট্রিক জাতিগোষ্ঠীর একটি শাখা। গ্রিয়ারসন সাহেব খেড়িয়া- ভূমিজদের ভাষা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, খেড়িয়া-ভূমিজদের ভাষা মুণ্ডা ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যেই পড়ে[৩]। যদিও এখন তাদের সেই অকৃত্রিম ভাষা নেই, এখন তারা হিন্দি- বাংলা মিশ্রিত খোট্টা ভাষায় কথা বলে। ঢেকারোরাও এই ভাষাগোষ্ঠীরই মানুষ। কাজেই ঢেকারোরা এইরকমই কোনো গোষ্ঠীরই শাখা। ভূমিজ, বিরহড়দের পূজিত একটি অপদেবতাও এদের পূজিত অপদেবতা। বিরহড়রা যাকে 'বাঘুতবোঙ্গা' বলছে, ভূমিজ আর ঢেকারোরা তাকে শুধু 'রাঘুত' নামে ডাকে। আবার ঢেকারোরা যাকে 'মোহনগিরি' বলছে, খেড়িয়ারা তাকেই 'মোহঙ্গিরিং' অপদেবতা রূপে পূজা করে। ঢেকারোরা ১লা মাঘ থেকে আরও কয়েকটি অপদেবতার পূজা করে, যেমন- ডাকিনি, চোরসানা, জোকসানা, রাণীমা প্রভৃতি। এছাড়া পরবর্তীকালে তারা বাঙালি জাতির সংস্পর্শে এসে কালীপূজা ও মনসাপূজা দুটি করে। কিন্তু অপদেবতাগুলিই তাদের জাতিসত্তার সঙ্গে জড়িত। পূজাপদ্ধতিও একইপ্রকার মদ, মাংস, রক্ত, ও সিঁদুরযোগে। এই পূজাবিধি বড় ভঙ্কর। পায়রা, মুরগি বলি দেবার পর সেই বলির রক্তের সঙ্গে এক কৌটো সিঁদুর মিশিয়ে মগয়া ঢাকের বাজনার সঙ্গে বিভোর হয়ে নাচতে নাচতে তা পান করে ঢেকারো পুরুষেরা। উপজাতি ও ধর্মীয় কালচারে এর থেকে আদিমতা আর কি হতে পারে? আবার পশ্চিমবঙ্গে 'কোঁড়া' নামের যে জনজাতিটি রয়েছে, মাটিকাটা যাদের জীবিকা বলে ধরা হয়, তাদের জাতিসত্তার গ্রামপঞ্চায়েত

প্রথার সঙ্গে ঢেকারোদের অঞ্চলপ্রথা ও বিচারালয় বেশ মিলে যায়। কোঁড়া সমাজে অঞ্চলপ্রধান হলেন 'পাঁড়ে' বা 'পারমানিক', মন্ত্রদাতা হলেন 'ছেঁড়িদার' এবং অঞ্চল তত্ত্বাবধায়ক হলেন 'এইন মোড়ল'। ঢেকারো সমাজেও 'মোড়ল', 'ছেড়িদার' এবং 'পারমানিক' অর্থাৎ প্রামাণিক রয়েছে। কোনো সমস্যা হলে লোকে প্রথমে ছেড়িদারকে বলবে, ছেড়িদার মোড়লকে জানাবে এবং শেষে প্রামাণিক মীমাংসা করবে। এই ভাবে ঢেকারো জাতি গোষ্টীটি আদিম জনজাতিরই পরিচয় বহন করে। এছাড়া আরও কয়েকটি প্রমাণ সূত্রাকারে তুলে ধরা যেতে পারে।

১। হো- জনজাতিটির সঙ্গে ঢেকারো জাতিটির চরিত্র ও স্বভাবগত মিল দেখা যায়। ঝাড়খণ্ডের সিংভূম জেলার বিশেষত চাইবাসার পার্শববর্তী অঞ্চলে যে হো-জনজাতিটি রয়েছে, স্বভাবে তারা তেজস্বী ও লড়াকু। এক সময় এরা ইংরেজদের সঙ্গে লড়েছিল। সেই লড়াই-এর জন্য তারা 'লড়াকুকোল' নামে পরিচিত। কে বলতে পারে হয়তো ঢেকারোরা এই কোল জাতিরই বংশধর[৪]?

২। হো, মুণ্ডা এবং বিরহর জনজাতির মতো ঢেকারোরাও তাদের ঘরে প্রাচীন পদ্ধতিতে 'হাঁড়িয়া' মদ তৈরি করে ও সেই মদ পান করে।

৩। মুণ্ডা, সাঁওতাল, মাহালিদের মতো ঢেকারো সমাজের মেয়েদের মধ্যে হাতে ও গলায় উল্কি পরার রেওয়াজ আছে।

৪। সন্তান জন্মালে সাঁওতালদের মতো এদেরও পাঁচুটি ও নামকরণে পূর্বপুরুষদের নাম অনুসারে সন্তানের নাম রাখা হয়।

৫। সাঁওতাল, মাহালি জনজাতির মতো এদের সমাজে মৃতদেহ সৎকারে দাহ ও সমাধি- দু'য়ের প্রচলন আছে।

৬। মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মতো ঢেকারো সমাজেও দত্তক নেওয়ার প্রথা আছে।

৭। অন্যান্য উপজাতীয় সমাজের মতো এই জনজাতীয় সমাজেও পিতৃতান্ত্রিক। বাল্যবিবাহ প্রথা আছে।

৮। সাঁওতাল, কোঁড়া, প্রভৃতি জনজাতির মতো এদের সাঙ্গা প্রথা বা পুনর্বার বিবাহ প্রথা চালু আছে।

৯। এদের শারীরিক গড়ন মুণ্ডা এবং কোলদের সঙ্গে মিলে যায়। সাধারণত গায়ের রং কালো। ঠোঁট ও নাক মোটা। ঢেকারো মহিলারা স্বভাবে পরিস্কার ও সভ্য। অনেকক্ষেত্রেই এরা স্বাধীনতা ভোগ করে। বন থেকে তালপাতা সংগ্রহ করে ঠোঁঙা, থালা বানায়।

১০। ঢেকারোরা অন্যান্য জনজাতির মত গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন করে। এবং অন্যান্য অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মতো ছেলেরাই পিতার মৃত্যর পর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে।

১১। ঢেকারোদের ঘর হয় মাটির, ছাউনি খড়ের। অবশ্য এখন টালি ও টিনের চালও দেখা যায়। রান্নাবান্নার জন্য এখনো মাটির হাঁড়ি ব্যবহার করতে ভালবাসে এরা। বাড়িতে গাই-গরু পালনের পাশাপাশি মুরগি ও শূকর পালন প্রতিটি ঘরেই দেখা যায়।

১২। টোটেম ও ট্যাবুর ক্ষেত্রে অন্যান্য উপজাতিয় সমাজের মতোই প্রাণী বিষয়ক ও সব্জি বিষয়ক নিষেধ লক্ষ্য করা যায়। যেমন- ভেঁড়া, বোয়াল মাছ, ঝিনুক, চিচিঙ্গা ইত্যাদি। ঢেকারোরা পলাশ পাতা খায় না, কারণ চিতাভস্মের উপর ওদের পলাশপাতায় পিণ্ড দেওয়া হয়। ঢেকারোদের ভেঁড়া সংক্রান্ত নিষেধটির একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনি আছে। টোটেম বা ধর্মীয় প্রতীক হিসাবে তা অদ্ভুত ও অলৌকিক হলেও উপভোগ্য এবং সমর্থণে আদিম জনজাতীয় প্রকৃতিকেই ইঙ্গিত করে।

বীরভূমের ঢেকারো জনজাতিটির জাতিতত্ত্বে তিনপ্রকার বিভাজন আছে,- ঢেকারো, রণাকামার এবং রোয়ানি বা কাহার। এদের ভাষা এক। এদের মধ্যে কাহাররা জাতিহিসাবে নিজেদের উঁচু বলে দাবি করে, কারণ এদের সামাজিক অবস্থা কিছুটা উন্নত। এরা (কাহার) এখন আর অপদেবতার পূজা করেনা। কালী বা মনসার পুজো করে। এদের গোত্র বেশির ভাগই নাগ বা সাপ। রাণাকামারদের সঙ্গে ঢেকারোদের ওঠাবসা, এমনকি বিয়ে-সাদি, নেমন্তন্ন খাওয়া - সব কিছুরই চল ছিল। কিন্তু একবার হয়েছিল কি, ঢেকারোরা একটি ভেঁড়া কেটে রান্না করে রাণাকামারদের নেমন্তন্ন করে এবং একসঙ্গে ভজনে বসে। খাবার সময় ঢেকারোরা এক অলৌকিক দৃশ্য দেখতে পায়। ঢেকারোরা দেখে রান্না করা ভেঁড়ার টুকরোগুলি আকাশে উড়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ভেঁড়ার রূপ ধরে চিৎকার করতে করতে বিলীন হয়ে যায়। রাণাকামারা কিন্তু এই দৃশ্য দেখতে পেল না, তাই তারা বিশ্বাসও করল না। তখন থেকেই ঢেকারোরা নিজেদের রাণাকামারাদের থেকে পৃথক করে নেয় এবং একান্তভাবে বিশ্বাস করে যে, এই ভেঁড়াই তাদের বংশের আদিপুরুষ। তারপর থেকে ঢেকারোরা আর ভেঁড়া খায় না। বলা বাহুল্য এই ভেঁড়া আবার রাণাকামার ও কাহারদের কাছে বড় উপাদেয় খাবার। পশ্চিমববঙ্গের অন্যান্য আদিবাসীদের জাতিতত্ত্বের সৃষ্টি বা উৎপত্তি সম্পর্কে কিংবদন্তী মূলক কোনো না কোনো কাহিনি রয়েছে, ঢেকারোদের তেমন কোনো কাহিনি নেই, কিন্তু আমরা টোটেম বা ট্যাবু সংক্রান্ত এই কাহিনিটি গোত্র নির্ণয়ে তারই সমগোত্রীয় ধারা যেতে পারে। আদিম উপজাতীয় সমাজে কোথাও কোথাও তা ধর্মীয় প্রতীকের রূপ ধারণ করছে।

২.০ ঢেকারো জাতিগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য

১। উচ্চবর্ণের মেয়েকে ঢেকারো পুরুষ বিয়ে করলে সমাজ তাকে গ্রহন করে। নিম্নবর্ণের সঙ্গে বিয়ে করলে সমাজে পতিত হয়।

২। ন'বছরে মেয়েদের বিয়ে হয়। বারো বছরে ছেলেদের।

৩। বয়স্ক বিবাহ চলে। বয়স্ক বিবাহে বিবাহপূর্ব যৌনসংগম অপরাধ বলে বিবেচিত হয় না।

৪। বিধবাবিবাহ প্রচলিত। স্বামীর ছোট ভাই-এর সঙ্গে বিবাহ হয়।

৫। পুরুষেরা একাধিক বিবাহ করতে পারে।

৬। বিবাহ বিচ্ছেদের পর স্ত্রীরা অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারে। সন্তান- সন্ততি বাবার কাছে থাকে। কোলের সন্তান হলে মার কাছে থাকে।

৭। বনিবনা না হলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়।

৮। গ্রামের পাঁচজন লোক নিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ করা হয়।

৯। পুনর্বার বিবাহ অনুষ্ঠান করা হয়।

১০। কন্যাকে পাবার জন্য বরপক্ষকে ২৫ টাকা পন দিতে হয়। এছাড়া থালাবাসন, রূপোর অলঙ্কার, দানসামগ্রী লাগে।

১১। বিবাহে ঘটকের প্রয়োজন হয়, আবার প্রেমজ বিবাহও হয়।

১২। বিবাহ অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ থাকে না। মন্ত্রও নেই। অনুষ্ঠানে থাকে ভাণ্ডারী। এদের বলা হয় খোট্টা ভাণ্ডারী।

১৩। গর্ভবতী হলে কোন উৎসব বা পালন হয় না।

১৪। পুত্র বা কন্যাকে সমান চোখে দেখা হয়।

১৫। মঘরা ডোমেদের ধাত্রী হিসাবে নিয়োগ করা হয়।

১৬। সন্তান জন্মালে অশৌচ পাঁচ ছয় দিন হয়। পুত্র- কন্যার নামকরণ নিজেরাই করে।

১৭। কন্যা সন্তান কোন অবস্থাতেই অবাঞ্ছিত নয়।

১৮। মৃতকে দাহ করা ও কবর দুই-ই করা হয়।

১৯। দাহ করা ও কবর দেওয়ার সময় মৃতের মাথা উত্তর দিকে থাকে।

২০। দাহ করা হলে চিতাভস্মের উপর মৃতের ছবি এঁকে দেওয়া হয়। কবরের ক্ষেত্রে মাটির উপরে ছবি আঁকা হয়।

২১। চিতাভস্ম নিক্ষেপ করার কোন রীতি নেই।

২২। মৃত্যুর ক্ষেত্রে অশৌচ দশ দিনের হয়ে থাকে।

২৩। শ্রাদ্ধ নিজেরাই করে। কোন মন্ত্র নেই। ভাণ্ডারী মস্তক মুণ্ডয়ন করে।

২৪। মনসা ও কালী উপাস্য দেবী।

২৫। অপদেবতার পূজা হয়। আখ্যান, ঘাঘান, শেচান, উৎরান, মোহন-গিরি, ডাকিনি, যোগিনী এই সব অপদেবতা।

২৬। মাঘ মাসের ১লা তারিখ থেকে ৪ঠা তারিখ পর্যন্ত এই পূজা হয়।

২৭। দেব দেবীর উদ্দেশ্যে পাঁঠা বলি দেওয়া হয়।

২৮। পূর্বপুরুষদের শ্রদ্ধা জানানোর জন্য চৈত্রমাসের শেষ তারিখে উপোস করা হয়। এর পর আম আর ছাতু পূর্বপুরুষদের প্রেতের কাছে দেওয়া হয়। এই প্রেত গাছতলাতে, ঘরের উঠানে এমন কি ঘরের মধ্যেও থাকে।

২৯। দাহ বা কবর দিয়ে আসার পর পেছন ফিরে তাকানো নিষেধ।

৩০। কলেরা, বসন্ত বা কুষ্ঠে মারা গেলে কবর দেওয়া হয়।

৩১। শালগাছের পূজা প্রচলিত আছে।

৩২। বর্তমান জীবিকা প্রধানত খেতমজুরের।

৩৩। লোহার কাজ এখন অতীতের জীবিকা।

৩৪। পদবি ঢেকারো, লোহার, কামার।

৩৫। সমাজে মোড়ল, ছড়িদার ও প্রামাণিক আছে। তারাই বিচার করে।

৩৬। মোড়ল নির্বাচিত হয় না, উত্তরাধিকার সূত্রে হয়।

৩৭। কোনো তীর্থস্থান এদের কাছে গুরুতবপূর্ণ নয়।

৩৮। হাড়ি, মুচি, ডোম ও বাউড়িকে এরা নীচু জাত মনে করে। এদের জল চলে না। এদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠলে সমাজে পতিত হয়।

৩৯। নামকরণে মুণ্ডারি প্রভাব বড় একটা দেখা যায় না।

৪০। পুর্বপুরুষ সম্বন্ধে বীর রাজার কাহিনি জড়িত। বীর রাজা পনেরশো খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে বীরভূমের রাজা ছিলেন। তাঁকে নিয়ে বীরভূমে অনেক গল্প- কাহিনি শোনা যায়। সম্ভবত তাঁর সময় কালেই ঢেকারোরা অন্য কোনো স্থান থেকে বীরভূমে আসে।

৪১। এদের নিষিদ্ধ প্রাণী ও ফল; ভাঁড়া, ঝিনুক, চিচিঙ্গা ও চালকুমড়ো।

৪২। নারীদের স্বাধীনতা আছে, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্যাতন হয়।

৪৩। ঢেকারোরা গোমাংস ও শূকরের মাংস খায়।

৪৪। ঢেকারোদের গ্রামের পাশে লৌহপাথর থেকে লোহা নিষ্কাশনের পর পরিত্যক্ত টুকরো এখনো দেখতে পাওয়া যায়।

৪৫। পূর্বপুরুষদের দ্বারা নির্মিত মরচে বিহীন তলোয়ার, টাঙ্গি এখনো কোনো কোনো পরিবারে দেখা যায়।

৪৬। স্বাধীনতার পূর্বে প্রায় প্রতিটি পরিবারের উপর পুলিশি অত্যাচার চলেছে।

৪৭। এখনো কোনো কোনো পরিবারের নামে রাজনগর থানায় ক্রিমিন্যাল রেকর্ড আছে।

৩.০ বীরভূমে আগমনের কারণ

ঢেকারো জনজাতি পুরুষানুক্রমে দাবি করে আসছে যে, তারা বীরভূমের রাজনগররে বীররাজাদের সময়কালে ছোটনাগপুর থেকে বীরভূমে আসে। তারা এও দাবি করে যে, রাজনগররে বীররাজারা তাদের নির্মিত বর্শা, বল্লম, দা, তলোয়ার ব্যবহার করত। এই বীররাজারা তৃতীয় লক্ষ্মণ সেনের হত্যার পর থেকে অর্থাৎ ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে পঞ্চদশ শতকের শেষকাল পর্যন্ত আঞ্চলিক রাজা হিসাবে সামন্তপ্রভুর মতো ক্ষমতা ভোগ করত। রাজনগরে লোকমুখে কথিত বীরসিং, চৈতন্য সিং এরাকম দু'জন বীর রাজা[৫] । যাই হোক ঢেকারোদের কথা যথার্থ হলে ত্রয়োদশ শতকেই বীরভূমে এসেছিল বলে ধরে নেওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত মহিমানিরাঞ্জন চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'বীরভূম বিবরণ'-এর রামপুরহাট কাহিনিতে জানিয়েছেন - ১২৬০ খ্রিষ্টাব্দে বেলে-নারায়ণপুরে ব্যাপহারে কাঁচা ও পাকা লোহা তৈরি হত এবং প্রতিদিন গড়ে ১০,০০০ মজুরের অন্নসংস্থান হত[৬]। ঢেকারোদের ঝুমুর গানের একটি কলিতে সে ইতিহাস ধরা আছে- 'বেলিয়া- নাঢ়ানপুরে লেহা গেলাইলা রে'। কিন্তু আশ্চর্য যে, মহিমানিরাঞ্জনবাবুর বিবরণে বাউরি, ডোম, লেট প্রভিতি নামের তালিকায় ঢেকারো নামটি নেই। এর করণ কি? আসলে তখন ঢেকারোরা নিজেদের 'ঢেকারো' রূপে জানতো না, মনে হয় সংখ্যালঘু ও বিচ্ছিন্নভাবে বেঁচে থাকার দরুন তারা যাযাবর সুলভ জীবনযাপন করত। ঢেকারোদের এই কুৎসা রটনা মূলক জাতিনির্দেশক পদবীটি অনেক পরবর্তীকালের, ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের ঘাটনা। তার আগে ঢেকারোরা আর পাঁচটা জনজাতির মতো সামাজিকভাবেই জীবনযাপন করত। কিন্তু তখন তারা কি পদবী নামের সঙ্গে ব্যবহার করত তা আজ আর জানবার উপায় নাই। দু-একজন ঢেকারোর বাস্তুভিটের যে কাগজপত্র পাওয়া যায়, খুববেশি হলে তা একশ বছর পুরাতন হবে। ধরে নেওয়া যেতে পারে ঐ সময় থেকেই জনজাতিটির চুরি- ডাকাতিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে 'ঢেকারো' পদবী যুক্ত হয়। পরবর্তীকালের ইতিহাসও এই সাক্ষী দেয়। মহিমানিরাঞ্জনবাবু জানিয়েছেন - ১২৯০-৯৪ খ্রিষ্টাব্দে বিদেশি লোহার আমদানির করনে বেলে-নারায়ণপুরের লোহার কারবার বন্ধ হয়ে যায়[৭]। অনুমান করা যায়, তখন থেকে পরবর্তী বেশ কয়েক শ'বছর ঢেকারোরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে পাথর রহেকে লোহা গলানোর ও যন্ত্রপাতি নির্মানের কাজটি করেছিল। কারন বীরভূম ও ঝাড়খণ্ডের ঢেকারো গ্রামগুলির আশেপাশে এখনো উচুঁ উচুঁ ঢিবি অর্থাৎ যেখানে লোহার চুল্লিগুলি ছিল তার চিহ্ন এবং ঝাঁঝরা করা এক প্রকার পোড়া পাথরের টুকরো স্থানগুলিতে কুড়িয়ে পাওয়া যায়। এই সময়পর্বে ঢেকারোরা মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মত আর একটি পেশায় নিযুক্ত ছিল। স্থানীয় জমিদার ও সামন্তপ্রভুরা নিজেদের জমিজায়গা ও সম্পত্তির তদ্বির করবার জন্যে ঢেকারোদের 'লেঠেল' হিসাবে নিযুক্ত করেছিল। ঢেকারো পুরুষদের মত ঢেকারো মহিলারাও কর্মঠ ও শক্তপোক্ত। তারাও ক্ষেতে খামারে কাজ করত। বোঝা যায়, সেইসময় জমিদারদের সঙ্গে ঢেকারোদের সম্পর্ক খারাপ ছিল না। ঢেকারোদের জাতব্যবসার পাশাপাশি ক্ষেতে খামারের প্রতি আকর্ষণ শুরু হয় সেইসময় থেকেই। ১৭৭৮-৭৯ খ্রিষ্টাব্দে ফার্কুহার নামের এক সাহেব ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে বীরভূমের লোহামহালগুলির করবারের অনুমতি পায়। সেখানে মুসলমানদের পাশাপাশি ঢেকারোরাও কছুদিন লোহা

গলানোর কাজ করেছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই দেশীয় জমিদাররা ফার্কুহার সাহেবের বিরোধীতা করে এবং তারা সাহেবকে হটিয়ে লোহামহলগুলির অধিকার দখল করে বসে। ফলে বীরভূমে লোহার করবারে ভাটা পরে। আর এরই ফলস্বরূপ জমিদারদের সঙ্গে ঢেকারোদের সম্পর্কের ছেদ ঘাটে[৮]। মহাশ্বেতা দেবীর 'বর্তিকা'-য় বলা হয়েছে, ঢেকারোরা সরাসরি ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছ[৯]। এর কোনো সুনিশ্চিত প্রমান পাওয়া যায় না, তবে ঢেকারোরা বহুবার ইংরেজদের মদতপুষ্ট জমিদারদের সঙ্গে লড়াই করেছিল। তাছাড়া সাঁওতাল বিদ্রোহে সাঁওতালদের পাশে থেকে অস্ত্র সরবরাহ করে ইংরেজদের শত্রু হয়েছিল তারা। ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্রোহে অস্ত্র সরবরাহ করার কথা তাদের ঝুমুর গানে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে[১০]। ঢেকারোরা ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে মহম্মদবাজারের 'ম্যাকে' কোম্পানির আমলেও লোহা গলিয়েছে। সেখানে তারা দলগতভাবে দশ বছর কাজ করেছিল বলে জানা যায়। এবং তখন তাদের কিছুটা অবস্থারও উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানি উঠে যায়। যার ফলস্বরূপ ঢেকারো জনজাতিটি হতাশ হয়ে পড়ে। ঢেকারোদের চুরি- ডাকাতির ইতিহাস শুরু হয় এই সময় থেকে। এই সময় থেকে তারা আগ্নেয়াস্ত্রে হাত পাকাতেও শুরু করে। ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে 'বারণ' নামের একটি কোম্পানি বীরভূমে লোহাগলানোর কাজ শুরু করলেও ঢেকারোরা সেখানে আর কাজ পায়নি। লক্ষনীয়, এরই মাঝখানে ইংরেজ সরকার ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে 'ক্রিমিন্যাল ট্রাইব অ্যাক্ট'-এর মাধ্যমে লোধা, শবর, খেড়িয়াদের মতো ঢেকারো জনজাতিটিকেও 'অপরাধপ্রবণ' জাতিগোষ্ঠী রূপে চিহ্নিত করে পুলিশি ব্যবস্থার মাধ্যমে ধরপাকর শুরু করে ও জাতিটিকে শায়েস্তা করার চেষ্টা করে।

৪.০ ঢেকারো জনজাতির রীতিনীতি

জন্ম - সন্তান প্রসব কালে দাইমা থাকে। জন্মের পাঁচদিনে একটা পাঁচুটে করা হয়। তাতে খোট্টা নাপিত ডেকে নখ কাটা হয়। জন্মের পর রান্না করা হাঁড়ি-খোলা (মাটির) ফেলা হয়। অন্যান্য পাত্র হলে মেজে পরিস্কার করে নেই। প্রসূতিকে ভাত খওয়ানো হয়। সাতদিনে ষষ্ঠী পাতা হয় আঁতুরঘারে। তেল-সিঁদুর-কাজল দিয়ে দাইমা দ্বার পূজা করে থাকে। শরের কলম, খাতা, কালি, বিছানার পাশে রাখা হয়। পৃথক বাড়ি না থাকলে বসত বাড়ির একধারে আঁতুরঘর করে নিতে হয়। নামকরণ কোন কিছুকে স্মরণ রাখার জন্য, বা বারের নাম অনুসারে, পুরাণ অনুসারে, ঘটনা অনুসারে বা পূর্বপুরুষের নাম অনুসারে করা হয়।
অন্নপ্রাশন - পুত্র সন্তান হলে পাঁচ মাস, কন্যা সন্তানের বেলায় সাত-নয় মাস বয়সে অন্নপ্রশন করা হয়। বাড়িতে যে সব দেব-দেবী ও অপদেবতা আছে তাদের থানে পুজো দিয়ে প্রসাদ শিশুকে চাটানো হয়। কোন উৎসব বা নিমন্ত্রণ করা হয় না। পাশের পাড়ার লোকজন ও শিশুর মামাবাড়ির লোককে ডাকা হয় সামর্থ থাকলে।

বিবাহ - বিবাহ অনুষ্ঠানের আগে বর ও কনে উভয়পক্ষই কালী, মনসা, বা অপদেবতার পূজা করে পাঁঠা বলি দেয়। নতুন শাড়িতে জলসাইতে দুটো ঘটি ঢাকা দিয়ে বিবাহিত মেয়েরা পুকুর থেকে জল আনতে যায়। জামাই বলি দেবার খাঁড়া নিয়ে যায়। পুকুরের ঘাটে একটা থালাতে ধান, দূর্বা, গোবর, তেল, ধূপ, সিন্দুর, কাজল, মুরগির ডিম দিয়ে পূজা করা হয়। কনে কোন একটি মোলগাছে সাতপাক সূতো জড়ায়। একবার বিয়ে হওয়া পুরুষ ও মেয়েরা গাছটাকে স্পর্শ করে থাকে। অন্য মেয়েরা পুকুর থেকে আনা ঘটির জলে গাছটিকে পুজো করে। কনে মোলগাছে বাকল কামড়ে সাতবার মায়ের আঁচলে দেয়। মা ঐ বাকল খায়। কনে মায়ের কোলে স্তনের দুধ খায়। অবশিষ্ট জলটা মোলগাছের গোড়ায় ঢেলে দেওয়া হয়। মা গাছটাকে প্রনাম করে। এর পরে গান বাজনা করতে করতে সকলে ফিরে আসে। এদিকে বরপক্ষও জলসাইতে যায়। তারা আমবাগানে আমগাছকে কেন্দ্র করে ঠিক একই রকম অনুষ্ঠান করে। এখানে ঘারের জামাতার মুখ্য ভূমিকা থাকে।

বিবাহ অনুষ্ঠানে বরের বাবার কোলে বর বসে। কনে কনের বাবার কোলে। একটা চাদরে তাদের ঢাকা দেওয়া হয়। ভাণ্ডারী কনের নখ কেটে দেয়। নখ কাটতে গিয়ে অন্তত এক ফোঁটা রক্ত বেরুবে। সেই রক্তে সূতো, আমপাতা, হলুদ সহ ভেজানো হয়। তারপর তা কনের হাতে বেঁধে দেওয়া হয়। কনেপক্ষ দক্ষিনা বাবাদ শালপাতায় চাল আর পাঁচশিকে পয়সা দেয়। বরপক্ষের আনা জলে আমপাতা ভিজিয়ে ভাণ্ডারী সাতবার বর ও কনের কপালে ঠেকিয়ে দেয়। এরপরে বর ও কনে উভয়ে উভয়ের কপালে কপাল ঠেকায়। বরপক্ষের আনা তেল ও সিঁদুর, বর কনের কপালে সাতবার ঠেকায়। বর তার গলার আকন্দের মালা কনেকে পরিয়ে দেয়, কনেও তার মালা বরকে পরিয়ে দেয়। এই সময় উলুধ্বনি আর গান হয়। এবার চাদরে ঢাকা খুলে দেওয়া হয়। বরপক্ষের লোকেরা কনেকে বরপক্ষের দিকে নিয়ে যায়। দুই বেয়াই কোলাকুলি করে। সকালবেলাতে দুজন একসঙ্গে বসে

মদ্যপান করে আর কোলাকুলি করে। বরপক্ষ যৌতুক হিসাবে কনের আঁচলে চাল, থালাবাসন, গহনা, ও সেই সঙ্গে নগদ বারো থেকে পনেরো টাকা দেয়। এরপর সাতপাক ঘোরা হয়। কনে আগে, বর পেছনে। কনের বাবা জামাইকে কোলে নিয়ে ঘরের মধ্যে যায়। কনের মা কনেকে নিয়ে যায়। শালপাতাতে চাল দেওয়া হয় দুজনকে। সেই চাল কনে খায় কিন্তু বর অভিমানে বসে থাকে। তখন তার অভিমান ভাঙার জন্য কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে কনে। মদসহ খাওয়া দাওয়া চলে। তখন উভয় পক্ষের মধ্যে বচশা ও ঝগরা শুরু হয়। তখন সেই বচশা থামানোর জন্য ঢেকারোরক বলে থাকে চ্যালকাঠ ব্যবহার করতে হয়। বরপক্ষ পায়ে হেঁটেই শোভাযাত্রা করে বিদায় নেই।

মৃত্যু - এদের সমাজে মৃতের দাহ ও সামাধি দুইই প্রচলিত। মৃতদেহ পাশের নদীতে দাহ না সমাধিস্ত করা হয়। ছোঁয়াচে রোগে মরলে সমাধি দেওয়া হয়। মৃত্যু ঘটলে আত্মিয় পরিজনকে খবর করতে হয়। মৃতের শরীরে হলুদ তেল মৃতের গায়ে মাখানো হয়। মৃতের ছেলে থাকলে মুখাগ্নি করবে কুঁচকাঠিতে তুলো দিয়ে আগুন ধরিয়ে। অগ্নিদাতার জামাইবাবু অগ্নিদাতার চোখ দুটি বন্ধ করে তিন পাক ঘুরে তিনবার মুখে আগুন ঠেকাবে। অগ্নিদাতাকে শ্মশানে যেতে দেওয়া হয়না, পিছনে ফিরে তাকাতে দেওয়া হয়না। শ্মশানে সমাধি দিলে উপরে পাথর দেয়, মাথায় পাথর দেয়। কাঁটা দেয়। দাহ করলে শেষে চিতাভস্ম জল ছিটিয়ে নিভিয়ে ফেলে। চিতার উপর নকল মানুষ এঁকে নুতন ভাঁড়ে ভাত রান্না করে পলাশ পাতায় পিণ্ড দান করে। শেষে মৃতের ছেলে বা আত্মীয় লাঠি নিয়ে পিছন দিক থেকে উবু করা ভাড়টিকে বেড়িয়ে ভেঙে হরিধ্বনি দিয়ে চান করে বাড়ি ফেরার পথে তেরাস্তায় কাঁটা পাথর দিয়ে তা ডিঙিয়ে বাড়ি ফেরে। ফেরার পথে কোন বটগাছ কিংবা পাকুর গাছকে গালাগালি করে বাড়ি ফিরে আসে।

মৃতের ঘারের সামনে কোনাডাঙার ধানের তুষের আগুন কিংবা ভেলা ফলের আগুন থাকবে। নিমপাতা, আতপ চাল আর জল থাকবে। সেগুলো দিয়ে পা ধুয়ে মুখে নিয়ে হরিধ্বনি দিতে দিতে যে যার বাড়ি ফিরে যায়। দশদিন ধরে স্বগোত্রীয়রা আমিষ খাবে না। পুকুরঘাটে কিংবা নদীর ঘাটে নাপিত নিয়ে ক্ষৌরকর্ম করে নতুন জামাকাপড় পরে স্নান করে বাড়ি ফেরে। ছেলে মাথা মুণ্ডিত অবস্থায় দশজনের সামনে গড়াগড়ি দিয়ে দশজন প্রনাম করে। তারপর আত্মীয়স্বজন সকলে খাবার খেতে বসে যায়। কাবার আগে হরিধ্বনি দেয় ও পরে হরিধ্বনি দেয়। যারা মদ খায় তারা হরিধ্বনি দিয়ে মৃতের উদ্যেশ্যে মদ নিবেদন করে। মূলত ক্ষৌর কর্মের দিন ভোজ করে সব সেরে ফেলে হয়।

৫.০ ঢেকারো জনজাতির ঝুমুর গান

ঢেকারো সমাজের ঝুমুর গানগুলিই এই জাতিটির লোককথার একমাত্র সম্পদ। ঢেকারোদের নিজেদের ভাষায় কোনো লিখিত তথ্য বা উপাদান পাওয়া যায় না। যেটুকু পাওয়া যায় তাহল এই মৌখিক পরম্পরায় চলে আসা এই ঝুমুর গান। ঢেকারো জনজাতির ভাষা বিশ্লেষণ করার সময় এগুলই অন্যতম উপাদান হিসাবে গ্রহন করতে হবে আমাদের। ঢেকারো সমাজের সুখ এবং দুঃখের সমানুপাতে এই ঝুমুর গানগুলি রসিকগন বেঁধে গেছেন। ঢেকারো সমাজে ঝুমুর গানগুলি যার বাঁধেন তাদের রসিক বলা হয়। গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচের অভিনব মুদ্রার বিশেষত্বও আছে। সাধারণত বিয়ের সময় এই চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। গোবর দিয়ে নিকানো মারুলির মতো গোল করা সূর্যের ছবিতে একটি সুসজ্জিত মহিলা সুঠাম ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে দু-দু বার খালি গলায় গানের কলিটি সুন্দর করে সুর দেবে। তারপর একসাথে দু-হাত এবং দু-পাকে এক বিশেষ ভঙ্গিতে পরস্পর বিপরীত দিকে বিস্তারিত ছুঁড়ে ছুঁড়ে রচিত হবে সেই নাচের বিশেষ মুদ্রা। আর গোলকরে বেষ্টিত নেশাচ্ছন্ন পুরুষ তৎক্ষণাৎ মাদল বাজাবে আর তালে তালে আর নাচতে থাকবে। ঢেকারো সমাজের নাচের এই দৃশ্য বড়ো মনোহর, গানের কলিও বড় ইঙ্গিতময়।

"একটা বেগুন তোড়াইলা গেলেই
ভুঁকি গেলেই কাঁটা
দিদি আয় না দিদি আয় না
কাঁটাহা কাঢ়ি দে
দিদি আয় না"

একানে কাঁটা ফোটার ইঙ্গিতটি অবশ্যই আদিমতার ইঙ্গিত। যা ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় নববধূটি তার জা অর্থাৎ দিদিকে ব্যক্ত করেছে। এইরকম দু-একটি গান হল-

"ফালি কদমা ফেলি, মিছেই করো ভালাভালি গো
জালি কদমা খেলি কি পাবা আস্বাদন
জালি কদমা বঁধু ছুঁয়ো না এখন"।

অথবা

"হামে যে রসিক হব- সারারাতি গীত গাব
সহিকা সব নাচ হবে হাত ধেরা ধেরি-
নিকুঞ্জবনে যাই লাগাব ঝুমার"।

ঢেকারো জনগোষ্ঠীর দ্বিতীয় পর্বের গান গুলিতে আছে জেলজীবনের কথা, ব্রিটিশ প্রশাসনের অত্যাচারের কথা।

"হাতে শাঁখ নথ পিঁধেছি
বিহালি পুরুষ ছেড়েছি
মরদ গেলেই জেহেলখানা
হামে এখেন যৈবনা
কি কেরিয়া রহব এক
তাই সাঙ্গা করেছি
হামে বেশ করেছি"।

-এখানে একটি যৌবনবতী বিরহিনী ঢেকারো রমণী অনন্যোপায় হয়েই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। এই অকপট স্বীকারোক্তি আমাদের মুগ্ধ করে।

পুলিশি অত্যাচার তাদের ঘরের শান্তি কিভাবে নষ্ট করেছে তারও করুন ছবি ধরা পরেছে ঝুমুর গানগুলিতে।

''আঁধারে জোনাক রাতি
চমকে উঠল ছাতি
কুকুর ভুকেই সারারাতি
ভেটলে রে দেউরা
দুপহর রাতিয়া
কেকের পিয়া যায় বাণে ভাসি
রূপো দেখি পান কাঁদে গো
কেকের পিয়া যায় বাণে ভাসি'' ।

গভীর রাত্রিতে বা ভোরে পুলিশের বাঁশি কানে গেলেই ঢেকারো পুরুষেরা প্রথমে তরোয়াল বন্দুক সামলে নিত। একটি গানে সেই ধরপাকর অশ্রুসজল ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে।

"গেরুয়া বসন বঁদুক ধারি, দারোগা আহেলা ঘোড়াই চরি
দেলা হামার হাতে বেড়ি- নিশি ভোরে,
ছেলিয়া পুলিয়া ঘুমাইছিলা, মায়ের ডাকে উঠি গেলা
দুনয়ন বহে ঝর ঝর গো। নিশি ভোরে.....
আগুপিছু তরুয়াল সামাল
আমার কাঁদালে রে নন্দলাল
এ্যাহে তরুয়ীল দুদিকে ধারালো রে
বিটিশের পুলিশ বাহিনী না শুনাতোই দুখের কাহিনি
হাতে দেতোই বেড়ি- জেহেল খানায় গড়হাগড়ি
রে নন্দলাল। আগুপিছু তরুয়াল সামাল"।

আবার কিছু কিছু ঝুমুর গান জনজাতিটির ঐতিহাসিক পরিচয় ও বহন করে।

"লোহাক কারবারি হারি লেল্যা গো বিটিশ

লোহাক কারবারি কাড়হি লেল্যা।
লেহা গেলাইলা বারে বারে
পুলিশের হাতে পড় লহ ধেরা গো।
কি করব কাঁহা যাব কাঁহা গেলেই পান জুড়াব,
কি কহব দুখের কথা, দুঃখ হামার পানে গাথা
হায়রে হায়- এ্যানে দুঃখু বিটিশ দ্যেই গেলে গো
লোহাক কারবারি কাড়হি লেল্যা"।

আবার তাদের একটি গানে গভীর দুঃখের ও কষ্টের দীর্ঘশ্বসমথিত প্রাণ যেভাবে উৎসারিত হয়েছে-

"কলপি কলপি উঠেই হামুর পরাণ
করমেকের রজনী মাদলের তান
জেলহাজতে দিন গেলি
খেয়ে গেলি ইজ্জতের মান"।

ঢেকারোদের একটি ঝুমুর গানে সাঁওতাল বিদ্রোহের চমৎকার সমর্থন আছে। সাঁওতাল বিদ্রোহের অনেক ঘটনাই যে এখনো অলিখিত আছে- ঢেকারোদের এই গানটিতে তার প্রমান আছে।

"সিধু-কানু আহেলা লগর গোবড়ায় গো
শালপাতেক ডাক দিলা, যতেক সামতাল জড়ো হেলা
কামার কুমার তাঁতি সবে যতই পরাণ যায় গো
হাতের বঁদুক বলম গাঁতি, ঢিকার কামার জাতি
এ্যাহে বেসাতি বন্ধ হইলা কি হবে উপায় গো
বিটিশের পুলিশ বাহিনি না শুনতেই বাধাখানি
রক্তেরাঙা পানি, নদী কুশকর্ণি বান যায় গো
মঙ্গল মাঝির হইল ফাঁসি কালিদহের ইগার গাছে গো
যত তীর- দারে ধীর- বঁদুক গর্জায়
সাক্ষী রহে ভদ্রকালী মায় গো
সিধু-কানু আহেলা লগর গোবড়ায় গো"

জনশ্রুতি আছে রাজনগরের মহারাজার সখের দীঘি কালিদহের দক্ষিনে অতিবৃদ্ধ গাবগাছটির ডালে সেদিন মঙ্গল মাঝির ফাঁসির সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার সাঁওতালকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল।

৬.০ ঢেকারো জনজাতির ভাষা

ঢেকারো জনজাতি অপর জাতি বা মানুষ জনের সঙ্গে কথা বলার সময় স্থানীয় বাংলার কথ্যরূপ ব্যবহার করে থাকে, কিন্তু নিজেদের মধ্যে কথোপকথনের সময় হিন্দি বাংলা মিশ্রিত এক ধরনের ভাষা ব্যবহার করে থাকে। এই বিশেষ ভাষাটিকে ঢেকারোরা "খোট্টা" ভাষা বলে থাকে। একটি নমুনা দেওয়া যেতে পারে- "কাঁহা খাটিলেকে জালছেবে", বা " আস্থেকে ন কহি পারো।" এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক যে সরকারি ভাষা তালিকায় বীরভূমের এই জনজাতিটির ভাষার কোনো উল্লেখ নেই। এই জনজাতিটির একটি বড় অংশের বাস ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল পরগণায়। সেখানকার দেওঘরী হিন্দি প্রভাব ভাষাটির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। আর আমরা জানি যে বাংলা ভাষাগত ক্রমবিকাশে দেওঘরী হিন্দির প্রভাব খুব তুচ্ছ নয়। বর্তমানে ঢেকারোদের মধ্যে এই ভাষার ব্যবহার ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। নতুন প্রজন্মের কাছে এই ভাষার ব্যবহারা একেবারেই নেই। বর্তমানে ঢেকারোদের ভাষা মৃতপ্রায়ের তালিকাভূক্ত।

ঢেকারো জনজাতিটি অখণ্ড বিহারের ছোটনাগপুর সিংভূম ও দেওঘর থেকে এসেছে বলে তারা দাবি করে। আর আমরা জানি যে এই সব অঞ্চলের কথ্য ভাষা হল ভোজপুরী, যার কোনো লিখিতরূপ নেই। এই ভোজপুরীর একটি অপভ্রংশ রূপ হল “খোট্টা

ভাষা"। আচার্য সুকুমার সেন তাঁর 'ভাষার ইতিবৃত্ত' বইতে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার যে বিভাজন করেছেন তার মধ্যে 'প্রাচামধ্যা' থেকে 'পূর্বী হিন্দি'-র এসেছে এমনটি তিনি দেখিয়েছেন। এই 'পূর্বী হিন্দি'-র আবার তিনটি বিভাজন, যথা- 'অবধী', 'বঘেলী' ও 'ছত্তিশগড়ী'। আর এই 'অবধী'-র তিনটি ভাগ, যথা- 'ভোজপুরী, 'মগহী' ও 'মৈথিলি'[১২]। এই ভোজপুরী থেকে দেওঘরী খোট্টা ভাষা থেকে ঢেকারোদের ভাষা এসেছে।

খোট্টা ভাষার কিছু লক্ষণগুলি হল-

১। 'অ' ধ্বনির দ্বিবিধ উচ্চারণ – প্রচীন বিবৃর 'অ' এবং নবাবির্ভূত সংবৃত 'অ' (কহব[অ], কবুতোর > কোহতোর)।

২। অনহি / অনহ বিভক্তি যোগে বহুবচন (ঘর > ঘরনহি)।

৩। বিভিন্ন কারকে অনুসর্গীয় প্রত্যয়ের ব্যবহার। যথা- 'কো', 'সে', 'মেঁ', 'পর'।

৪। বহুবচনে 'মেঁ', 'হমরি' ইত্যাদির ব্যবহার।

৫। '-অল', '-অব' যোগে যথাক্রমে অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল গঠিত হয় (হম দেখল, উ দেখব ইত্যাদি)।

৬। ভবিষ্যৎ কালে প্রথম পুরুষে '-হ' যুক্ত বিভক্তি রক্ষিত হয় (উ চলিহেঁ)।

৭। যৌগিক বাক্যে সহায়ক 'রহ' ও 'বাট' ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায় (উ আরত রহে)।

৮। অস্ত্যর্থক ধাতুর সঙ্গে '-খে' প্রত্যয় যোগ খোট্টা ভাষার বিশিষ্ট্য লক্ষণ (নহীখে, হখে ইত্যাদি)।

ঢেকারোদের ব্যাবহৃত ভাষার সঙ্গে খোট্টা ভাষার বেশ কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন- ১) ঢেকারোদের ব্যবহৃত ভাষাতেও 'অ' ধ্বনির দ্বিবিধ রূপ খ্যাঁজে পাওয়া যায়। ('মরিব[অ]', ডাক > ডাকো)। ২) কারকে অনুসর্গীয় 'কো' প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা যায় খোট্টা ভাষার মত- 'লোহাকো কারবারি'। ৩) ভবিষ্যৎ কালে প্রথম পুরুষে '-হ' যুক্ত হয়। যেমন- 'কি কেরিয়া রেহ একা' (কি করে একা থাকব) । ৪) বহুবচনে '-মেঁ যুক্ত হয়ে থাকে ঢেকারোদের ব্যবহৃত ভাষায়। যেমন,- 'হামে কৃষ্ণ, যত সখী গীত গাব সারারাতি'। ৫) বাক্যের শেষে 'গো' ধ্বনিটির ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন- 'হিয়াশালে দুনয়নে বহে রোল গো'।

৭.০ ঢেকারো জনজাতির লোকসংখ্যা

বীরভূম ও ঝাড়খণ্ড মিলে মোট কুড়িটি গ্রামে ঢেকারো জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা অনধিক ২০০০ মত। বীরভূম জেলার রাজনগর এলাকার সাহাবাদ, জাহানাবাদ, টাবাডুমরা, বেলেড়া কানমুড়া, রানীপুর, হরিপুর, সিউড়ী থানার লাঙ্গুলিয়া গ্রামে, এবং মহম্মদবাজার থানা এলাকার বৈদ্যনাথপুর, ও রাশপুর গ্রামে মোট ১৩০ টি পরিবারের বাস। অন্যদিকে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের কুণ্ডহিত থানা এলাকার খাজুরী, ঝাপদহ, আমলাহী, দামাধারা, জোকপাহাড়ি; রঘুনাথপুর থানা এলাকায় নান্দনা আর পাটজোর এবং নলা থানা এলাকায় ঘুসরোকাটা গ্রামে আনুমানিক ১৫০ টি পরিবারের বাস।

বীরভূম জেলায় এই জাতির জাতিভিত্তিক সংখ্যা গননার কোনো সরকারি রিপোর্ট পাওয়া যায় না। গবেষণার কাজে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ঢেকারো জনজাতির যতটুকু তথ্য পাওয়া গেছে তার তালিকা দেওয়া হল।

১। থানাঃ রাজনগর					
গ্রাম		পরিবার	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	বেলেড়া	২৯	১০০	৪৯	১৪৯
২	টাবাডুমরা	২১	৮৮	৩৪	১২২
৩	কানমুড়া	৭	৩১	১৩	৪৪
৪	রানীপুর	৪	১৭	১০	২৭
৫	সাহাবাদ	২৪	১০৫	৪৭	১৫২
৬	জাহানাবাদ	২	১১	৫	১৬
৭	হরিপুর	৭	২৭	১১	৩৮
২। থানাঃ সিউড়ী					

৮	লাঙ্গুলিয়া	১৩	৫১	২৫	৭৬
৩। থানাঃ মহম্মদবাজার					
৯	রাশপুর	১৫	৬৭	৩৫	১০২
১০	বৈদ্যনাথপুর	৮	৩৩	১৫	৪৮
মোট সংখ্যা		১৩০	৫৩০	২৪৪	৭৭৪

এদের মধ্যে ৬ জন বর্গাদার। জমি পাট্টা পেয়েছে ৩৫ জন। বি পি এল কার্ড পেয়েছে ২০ জন। অন্নপূর্ণা অন্ত্যোদয় রেশন কার্ড পেয়েছে ১০ টি পরিবার। প্রতিবন্ধি ১০ জন, তার মধ্যে ২ জনের শংসাপত্র আছে। ইন্দিরা আবাস যোজনায় নাম আছে ১০ জনের, যদিও সকলেই পাবার যোগ্য। রেশন কার্ড নেই ১৫০ জনের। দু-একটি পরিবার বাদে সকলেই শ্রমের উপর নির্ভরশীল। একশ দিনের কাজ নাম মাত্র পায়। ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ঢেকারো সমাজ কল্যান সমিতি'। এই সমিতির প্রধান উপদেষ্টা লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী। প্রতি মাসে নিয়ম করে অর্থ সাহায্য পাঠান আমেরিকা প্রবাসী সমাজসেবী গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পীভাক। তিনি ঢেকারোদের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের জন্য তিনটি স্কুল তৈরি করে দিয়েছেন। এদের মধ্যে মাধ্যমিক পাশ করেছে আট জন, উচ্চমাধ্যমিক তিন জন। মাত্র একজন প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করে। দুখসারী লোহার এক মাত্র ঢেকারো মহিলা যে মাধ্যমিক পাশ করে।

অধিকাংশ ঢেকারো পুরুষ ক্ষেতমজুরের কাজ করে। ধান পোঁতা ও ধান কাটার সময় শুধু কাজ পায়। সামান্য সংখ্যক লোক এখনো কামারের কাজ করে। কোদাল, গাঁইতি, কাস্তে, কাটারি, কুড়ুল এসব তৈরি করে। ঢেকারো ছেলেরা মাহিন্দারের কাজ করে, গরু চরায়। এতে একবেলা ভাত পায়, সামান্য কয়েক টাকা মাইনে পায়। শ্রাবন ভাদ্র মাসে ঘাস কেটে বিক্রি করে। খেজুরগাছ ও তালগাছ লিজ নিয়ে খেজুর গুড় ও তালের গুড় তৈরি করে। ঢেকারো মহিলারা আগে চিঁড়ে কুটতো। বর্তমানে চিঁড়ে তৈরির মেসিন চালু হওয়াতে তা এখন বন্ধ। তারা আগে ধান ভানতো। হাস্কিং মেশিন হওয়াতে তাও এখন বন্ধ। এখন গোবর কুড়োই, পাটকুরনীর কাজ করে। কিন্তু তাও সবসময় পায় না, কারণ উচ্চবর্ণের লোকেরা এদের সন্দেহ করে। শালপাতার ঠোঙা বানায়। খেজুরপাতা ও তালপাতা থেকে তালাই তৈরি করে। মহুয়া ফুল ও মহুয়ার ফল সংগ্রহ করে ঢেকারো মহিলারা।

৮.০ উল্লেখপঞ্জি

১। টুডু, বুদ্ধেশ্বর; *সাঁওতাল বিদ্রেহের কথা*
২। দেবী, মহাশ্বেতে (সম্পাঃ); *বর্তিকা,* ২০০২, পৃষ্ঠাঃ ১১৫
৩। Grierson, G.A.; *Linguistics Survey of India (Vol-4)*
৪। টুডু, বুদ্ধেশ্বর; *সাঁওতাল বিদ্রেহের কথা*
৫। চক্রবর্তী, মহিমানিরাঞ্জন; *বীরভূমের রাজবংশ* (পার্থ শঙ্খ মজুমদার, সম্পাঃ), পৃষ্ঠাঃ ৩২-৩৩
৬। চক্রবর্তী, মহিমানিরাঞ্জন- *বীরভূম বিবরণ,* দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ৯৫
৭। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ৯৬
৮। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ৯৬
৯। দেবী, মহাশ্বেতে (সম্পাঃ); *বর্তিকা,* ২০০২, পৃষ্ঠাঃ ৯৯
১০। শিবদাস লোহারের কাছ থেকে সংগৃহিত-

"সিধু-কানু আহেলা লগর গোবড়ায় গো
শালপাতেক ডাক দিলা, যতেক সামতাল জড়ো হেলা
কামার কুমার তাঁতি সবে যতই পরাণ যায় গো
হাতের বঁদুক বলম গাঁতি, ঢিকার কামার জাতি"

১১। মুখোপাধ্যায়, আদিত্য; *আঞ্চলিক ইতিহাসের সন্ধানে,* পৃষ্ঠাঃ ৯৮
১২। সেন, সুকুমার, *ভাষার ইতিবৃত্ত,* পৃষ্ঠাঃ ১৩৩